প্রান্তিক জনগণের মানবাধিকার এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা আকাংখার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবী সূচনার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে পাশাপাশি তার মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসন দ্বারা সংরক্ষিত হবে। আইনের শাসন নিশ্চিত করে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য্য। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১১ অনুচ্ছেদে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বিলম্বে হলেও সাংবিধানিক অঙ্গিকার এর সাথে সংগতি রেখে একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিশন দেশে বিদ্যমান মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় তদের উদ্বেগ ও সুপারিশ সম্প্রতি সরকারের নিকট পেশ করেছে। মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের মত স্থানীয় সরকারেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী সাধারন মানুষের জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান। প্রান্তিক জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সেবা তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বাস গ্রামে, যেখানে হত দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী, অসচেতন এবং নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণ প্রতিনিয়ত কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। প্রান্তিক জনগণের প্রতি সেবা ও সুযোগের বৈষম্য, জেন্ডার বৈষম্য, বঞ্চনা, এবং তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার লংঘনের ঘটনাসমূহের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে নানাভাবে জড়িত। যদিও ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং সদ্য পাসকৃত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর কোথাও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বা কার্যাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই। ডেমক্রেসিওয়াচ ২০০৬ সাল থেকে জনগণের দরবার প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮ টি ইউনিয়নে জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের সাথে সরাসরি কাজ করতে গিয়ে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করেছে।

সুবিধা বঞ্চিত মানুষ সাধারণত প্রভাবশালী মহল কর্তৃক কৃষি জমি, জলাভূমি, ঘর বাড়ি, অন্যান্য সম্পত্তি জবরদখল, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পাচার, জখম ইত্যাদি ঘটনার স্বীকার হয়। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিবাদমান পক্ষের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক (গ্রাম আদালত) ও অনানুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় (সালিশ) বিবাদ মিমাংসায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নের্তৃত্বের উপস্থিতিতে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধের নিস্পত্তি হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ তার সীমিত জনবল ও সামর্থ্যের মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৪ থেকে ৫টি বিচার সম্পন্ন করে থাকে যার সবকয়টিতে বিচারের গুনগত মান রক্ষা করা সম্ভব হয়না। অপরদিকে প্রচলিত গ্রাম্য সালিশের বিচার ও নানাভাবে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। সাধারনত বিচার প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের চাপ, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক মানুষেরা তাদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সকল বিচার প্রক্রিয়ায় নারী যুক্ত থাকে সেখানে জনসম্মুখে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক ও রায় প্রদান তাকে সামাজিক ভাবে পর্যদুস্ত ও হেয় করে তোলে, বিচার চাইতে এসে নারীরা আরও একবার সামাজিক মর্যাদা লংঘনের স্বীকার হন। বিচার প্রক্রিয়ায় অমানবিক প্রথা যেমন এক ঘরে করা, হিল্লা বিয়ে, দোররা মারা, বেত মারা, নাকে খত দেয়া, মাথা মোড়ানো ইত্যাদির অনুশীলন মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং তাকে সামাজিকভাবে হেয় করে তোলে। তবে লক্ষণীয় এ সকল অমানবিক বিচার প্রক্রিয়া সাধারনত জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও উগ্র ধর্মীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতায় সংগঠিত হয়। আবহমানকাল থেকে চলে আসা এই সকল কুসংস্কার, প্রথা চর্চার কারনে ইউনিয়ন পরিষদ ও সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা।

প্রান্তিক পর্যায়ে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা, টি আর, কাবিটা ইত্যাদি) চালু আছে। এ সকল কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন

সাহায্য ও অনুদান প্রান্তিক জনগণের জন্য সঠিকভাবে বন্টনের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী আদেশ ও নীতিমালা অনুসরণ করে সাহায্য ও অনুদান বন্টন করে থাকে। সাহায্য ও অনুদান বন্টনের বিভিন্ন পর্যায়ে দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতির কারণে যারা প্রকৃত সাহায্যপ্রার্থী তাদের কাছে সাহায্য পৌছায় না। অনেক সময় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণেও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সাহায্য বন্টন নীতিমালা অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়না। যার ফলে প্রান্তিক জনগণ আরো অসহায়ত্বের শিকার হয়ে উন্নয়নের মূলধারা থেকে ছিটকে পড়ছে। এ ছাড়াও সাহায্য ও অনুদান বন্টনে প্রায়ই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অভাব এবং অনিয়মের অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়।

তৃণমূলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন জনঅংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য। ইউপি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে (যেমন বাজেট ও প্রকল্প প্রণয়ন, স্থায়ী কমিটিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়) প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র এবং অধিকার রক্ষার সুযোগ তৈরী করে। সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে। আশা করা যায় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূলে বসবাসকারী মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অবহেলিত হয় নানা কারনে। বিশেষত, প্রান্তিক জনগণ শিক্ষিত না হওয়ার কারনে ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না এবং উৎসাহিত করে না। জনঅংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারন মানুষের পরিস্কার ধারণা না থাকায় তারাও একে গুরুত্বপূর্ন মনে করে না। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে যে সীমিত পরিমান জনঅংশগ্রহণ মূলক কার্যক্রম (উন্মুক্ত বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, এলজিএসপি গৃহীত প্রকল্প) বাস্তবায়ন করে থাকে সেখানে ও প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ কার্যত উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সমাজের সুবিধাভোগী, শিক্ষিত, সচেতন, নেতৃত্বদানকারী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জড়িত অংশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণে ইউনিয়ন পরিষদ যতটা তৎপর থাকছে অপরদিকে সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের অধিকার অনেকটাই উপেক্ষিত থাকছে।

স্থানীয় সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে সাধারন মানুষের সম অংশীদারিত্ব মূলধারার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যুক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ অন্যান্য সেবায় প্রবেশাধিকার তাদের ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করে স্বাবলম্বী করে তোলে। ইউনয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও সম্পদে প্রান্তিক জনগণের যে অধিকার বা অংশ থাকার কথা তা সব সময় রক্ষিত হয় না। সাধারণত শিক্ষিত, সচেতন, সেবা সম্পর্কে জানে এবং ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজন এই প্রতিষ্ঠানের সেবা সমূহ ও সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। তৃণমূলে বসবাসকারী সুবিধা বঞ্চিত নারী, ভূমিহীন, শিশু, শ্রমিক, প্রতিবন্ধিদের এই সকল সেবার সুযোগ এবং সম্পদের অংশীদারিত্ব থাকে স্বল্পই। ফলে সম্পদের উপর অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষেরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে না। এই ধরনের বঞ্চনা তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ যে সকল মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত অথবা যে সকল ঘটনা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে তার সবই যে সচেতন ভাবে হচ্ছে এমনটি নয়। সীমিত সম্পদ, জনবল, দক্ষতা এবং যথাযথ দিক নির্দেশনার অভাবই এর অন্যতম কারণ। একটি মানবাধিকার বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে উপযোগী করে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকারের নীতি নির্ধারনী মহল, গবেষক, গণমাধ্যম কর্মী, মানবাধিকার সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো,

১. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। মানবাধিকার রক্ষায় সামাজিক প্রতিরোধ জোরদার করতে হবে এই লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে ইউপি'র নেতৃত্বে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২. পূর্ণ কর্তৃত্ব, জনবল এবং ক্ষমতা প্রদান করে মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। যে সকল জনপ্রতিনিধিগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পাচার প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালন করছেন তাদেরকে এই কমিশন স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৩. গ্রাম আদালত ও সালিশ পরিষদ কার্যকর করতে নিম্ন আদালত, থানা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর সাথে সমন্বয় ও মনিটরিং এর সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিক (গ্রাম আদালত) এবং অনানুষ্ঠানিক (সালিশ) বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে মানবাধিকার ও দক্ষতার সাথে বিচার কার্য পরিচালনায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৪. ইউপি'র পরিকল্পনা প্রণয়নে, প্রকল্প বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করতে ইউনিয়ন পরিষদকে উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা পালনরত ইউপি'র জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

৫. ইউপি'র সেবা সমূহের তথ্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে যেন সেবা প্রাপ্তিতে প্রান্তিক জনগণ বৈষম্যের শিকার না হয়। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সাহায্য ও অনুদান বন্টন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অনুদান বন্টন প্রক্রিয়ায় নাগরিক মনিটরিং ও ফলোআপ এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. বিচার প্রক্রিয়া থেকে অমানবিক প্রথা (যেমন এক ঘরে করা, দোররা মারা, বেত মারা, হিল্লা বিয়ে নাকে খত দেয়া, মাথা মোড়ানো) এবং মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শণ করে এরুপ বিচার কার্য আইন করে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. ইউপি'র পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. দলিত বা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। সেবা প্রাপ্তিতে, সাহায্য ও অনুদান বন্টনে তাদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

১০. চরম মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার (ধর্ষণ, পাচার, শারীরিক নির্যাতন) ক্ষেত্রে অন্তত: প্রতিটি উপজেলায় একটি Victim Support Centre প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যেখান থেকে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সমূহকে মনিটরিং করা হবে এবং নির্যাতিতদের সহায়তা দেয়া হবে।

ডেমক্রেসিওয়াচ
৯ ডিসম্বর ২০০৯
'প্রান্তিক জনগণের মানবাধিকার এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা'
শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত
dwatch@bangla.net
www.dwatch-bd.org